শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বর্ণমালা ও বাংলা মুদ্রাক্ষর বিকাশের ইতিবৃত্ত

আহমাদ সালিম

মানুষের সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনে ভাষার উৎপত্তি এবং ভাষার গতিময়তা ও সমৃদ্ধির জন্য বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে। বর্ণ আবিষ্কারের পিছনে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতাই মৌল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আঞ্চলিক চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে এই সব বর্ণ যুগে যুগে, কালে কালে বিবর্তিত ও পরিশুদধ হয়েছে। আজো সরকারের দফতরে ব্যবহৃত ভাষাই জাতির ভাষা হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছে। যেমন ভারতে হিন্দি, পাকিস্তানে উর্দু ও বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত ও মর্যাদাভুক্ত। যদিও বাংলাদেশে সরকারীভাবে সর্বস্তরে বাংলা চালু করা সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিগত প্রভেদের কারণে মানুষের ভাষা ও বর্ণগত (অক্ষর) ভিন্নতা সুস্পষ্ট। তাই জাতিগত ভিন্নতার কারণেই ধ্বনিকে চিহ্নিত করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ধ্বনি বা অক্ষর অবিনাশী বলে বর্ণের আরেক নাম অক্ষর। আভিধানিকভাবে 'অক্ষর' একটি বিশেষ্য ও ক্লিবলিঙ্গার্থক শব্দ। এই অক্ষর প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা কবে থেকে কোন দেশে কিভাবে হয়েছিল আমরা জানি না। কিন্তু বিশ্বের সর্বপ্রথম বর্ণমালা হিসেবে সিমেটিক অক্ষর বা ফিনিশীয় বর্ণমালাকে বিশ্বের ভাষা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব ২৮০০ অব্দে এই সিমেটিক অক্ষরের ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছে। আর এই সব আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে ভাষা ও অক্ষরে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র ও প্রাচীন সভ্যতার মৌলিক চাহিদার স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

আজকের নিবন্ধে এই উপমহাদেশে বাংলা ভাষা ও বর্ণমালার আদি চরিত্র ও চাহিদার উপর সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব। প্রথমই বলা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবিধ লিপির ক্রমবিবর্তন ও আবিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্য সুমেরির লিপি, মিশরীয় লিপি, সিমেটিক লিপি, কুইবাচিত্রা লিপি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাক-ভারত উপমহাদেশে উদ্ধারকৃত লিপিসমূহের মধ্যে সিন্ধুলিপি ও ব্রাহ্মীলিপি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। তবে অন্যান্য লিপিসমূহ যেমনঃ গুপ্তলিপি, নাগরিলিপি, কুটিললিপি ও বাংলালিপি উদ্ধার পর্বের দ্বারাই পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং ক্রমবিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট ও লক্ষণীয়ভাবে তোলা হয়েছে। অই বাংলা বর্ণমালা আবিষ্কারের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। বিখ্যাত ভাষাবিদ ও গবেষক মিঃ ল্যাংডন তাঁর 'মহেঞ্জোদারো ও সিন্ধু সভ্যতা' নামক গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সিন্ধুলিপির বর্ণমালা হতেই অ ই ঈ ও ক গ ঘ চ জ ট ত থ প ফ ব ম য ল র প্রভৃতি। ব্রাহ্মী বর্ণের উদ্ভব হয়েছে অন্যভাবে। তাই বলা হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি বাংলা বর্ণমালার আদি চেহারা নয় বরং সিন্ধুলিপিই বাংলা বর্ণমালার আদি স্বরূপ। মুসলমানী সিন্ধু সভ্যতার ক্রমবিকাশকে একটি হিন্দু ভাবধারায় মূল্যায়নের জন্যেই ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাস স্পষ্টতই প্রমাণ করেছে যে, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মগধ অঞ্চলের কুটিললিপি হতেই বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে। বিহার, বঙ্গ, মিথিলা, নেপাল, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি দানপত্র, মুদ্রা ও হস্তলিখিত পুস্তকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে কুটিললিপি প্রচিলিত ছিল। এবং তখনই এ ও খ এরূপ কয়েকটি অক্ষরের বাংলালিপির স্বরূপ ফুটে উঠেছিল। তাছাড়া দেবপাড়ার লিপিতে এ খ ঞ ত ম র ল ও স বর্ণগুলোর কুটিল ও নাগরী বর্ণ হতে পরিবর্তনের পার্থক্যটি একাদশ শতাব্দীতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফলে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় সেনের খোদিত লিপিতেই বাংলা বর্ণমালার একটি সুস্পষ্ট অবয়ব এবং বাংলা বর্ণমালার অধিকতর প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় বিশখানা পত্রে এবং বিভিন্ন দানলিপি ও খোদিত লিপিতে বহুল পরিবর্তিত আকারে বাংলা বর্ণমালার মধ্যে দেখা যায়। সেই বাংলা বর্ণমালাকেই মূলতঃ বাংলা বর্ণমালার স্ট্যাণ্ডার্ড ধরা হয়।

বাংলা বর্ণমালার বিকাশে একটি বিরাট ক্রমবিবর্তন ধারার ইতিহাস আছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে আবিষ্কৃত বাংলা বর্ণমালার এই ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল।

১। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ও বানগড়ের দানপত্র — ৯৮০ খৃষ্টাব্দ

২। কম্বোজের রাজার হুর্দার দানপত্র ও বদালের স্তম্ভলিপি — ১০ম খৃষ্টাব্দ

৩। সারনাথে উৎকীর্ণ মূর্তিলিপি — ১০২৬ খৃষ্টাব্দ

৪। কৃষ্ণ দ্বারিক মন্দিরে খোদিত লিপি ও ক্রেতাবানের বেদীতে খোদিত লিপি এবং অক্ষয়বট ও আমগাছিলিপি — ১১০০ খৃষ্টাব্দ

৫। কাল চক্রাবতার পাণ্ডুলিপি ও দেবপাড়ার খোদিত লিপি — ১১২৫ খৃষ্টাব্দ

৬। আসামের দানপত্র — ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ

৭। সুন্দর বনের দানলিপি — ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ

৮। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ১৬৯৯টি পুঁথি ও গুহ্যাবলী বিবৃতির পাণ্ডুলিপি — ১১৯৮ খৃষ্টাব্দ

৯। তর্পণদীঘির দানপত্র, বৈদবেদের দানপত্র ও কলকাতা সাহিত্য পরিষদের দানপত্র — ১২০০ খৃষ্টাব্দ

১০। হস্রকোলে প্রাপ্ত শিলালিপির পুরা বর্ণমালা (বৌদ্ধতান্ত্রিক) — ১২০০ খৃষ্টাব্দ

১১। পঞ্চরক্ষা পুস্তকের পাণ্ডুলিপি — ১৩০০ খৃষ্টাব্দ

১২। বোধি চর্যারতার পুঁথি — ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দ

১৩। হস্তলিপি (বড়ু চণ্ডিদাসের শ্রীকির্তন) ও উড়িষ্যার দানপত্র — ১৫০০ খৃষ্টাব্দ

উপরোল্লিখিত আবিষ্কার ও গবেষণালব্ধ তথ্য প্রমাণিত করে যে বাংলা বর্ণমালা এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের এবং এইসব পরিবর্তনের চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করে বাংলা বর্ণমালাকে একটি সম্মানিত জাতির রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদায় পৌছতে হয়েছে। তাই বাংলা বর্ণমালারও একটি প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়, আমরা সেই ইতিহাসকে বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাউকে উপস্থাপন করতে দিতে পারি না। বাংলা ভাষা ও বাংলা বর্ণমালা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ও সম্পদ। অতএব, এর ঐতিহাসিক স্বীকৃতির সম্মান তখন বাংলাদেশের।

পত্র, দানলিপি, শিলালিপি, তুলট কাগজ, খোদিত লিপি ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল ও কঠিন অবস্থায় বর্ণমালার আবিষ্কার। কিন্তু এই কঠিন ও জটিল অবস্থা কাটিয়ে বর্ণমালাকে গতিময় রূপ দেয়ার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলা মুদ্রাক্ষর ও মুদ্রণ যন্ত্রের। তাই বাংলা মুদ্রাক্ষরেরও একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস পাওয়া যায়।

বাংলা মুদ্রণাক্ষরের ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর হতেই দেখা যায়, লিখন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই না করার কোন নির্ধারিত আকার-আকৃতি না থাকায় বাংলা অক্ষরের রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে সেটা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই দেখা যায়, সমৃদ্ধ বর্তমান বাংলা অক্ষরের আকৃতি বিকশিত হয় প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। অতপর, এর তেমন কোন পরিবর্তনের নজির দৃষ্ট হয় না বললেই চলে। কিন্তু তখনো কোন বাংলা মুদ্রাক্ষরের আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় ১৬৯২ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে। কিন্তু এর সঠিক কোন ইতিহাস নেই। ফলে ১৭৭৮ সালে চার্লস ইউল কিন্সের তৈরী বাংলা মুদ্রণাক্ষরকেই পাক-ভারত উপমহাদেশের বাংলা অক্ষরের স্থায়ী আকৃতি ধরা হয়। আর সেই থেকে বাংলা বর্ণমালার মুদ্রণ রীতিটি চালু হয়ে যায়। ফলে হাতের লেখা যার যেমনই হোক না কেন, অক্ষরের আকৃতি বা নমুনার আজ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হয়নি। মুদ্রণপ্রথা প্রচলিত হওয়ার দরুন অক্ষর ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে।

অবশ্য ইতিহাসের ভিন্ন তথ্যও পাওয়া যায়। জানা যায় যে, কোম্পানীর আমলে (১৭৭৮ খৃঅ) হালহেড রচিত 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ' বইটিতেই প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হয়নি, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড অনূদিত 'এ কোড অব জেনটো লর্স' পুস্তকে ও স্বতন্ত্র প্লেটে বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত 'ডেভিডমিলের' একটি বইয়ের শেষে বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি স্বতন্ত্র প্লেটে মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়া ১৭২৫ সালে প্রকাশিত জার্মানীর গেওর্গয়াকোর 'ইউরেনক সজেত' পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠাতে ১ হতে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা এবং ৫১ পৃষ্ঠার সম্মুখ প্লেটে বাংলা অক্ষরে 'শ্রী সরজন্ত বল পকাং' নামটি মুদ্রিত দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া মোগল শাসক বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় (১৭৫৯-১৮০৬) তাঁর নিজের উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে সাফল্যজনক মুদ্রণের কথা জানা যায়। ১৮০৩ সালে আগ্রা দুর্গ দখলের সময় এই মুদ্রণ যন্ত্র ইংরেজ সৈন্যদের হস্তগত হয়।

তবে ইতিহাসে ১৭৭৮ সালকেই বাংলা মুদ্রাক্ষরের সূচনাকাল বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সেভাবেই ইতিহাসে বাংলা মুদ্রণাক্ষরের সূচনা গ্রন্থের নাম হয়েছে। হালহেডের রচিত 'এ গ্রামার অব দি বেংগলি ল্যাংগুয়েজ' বইটি ইংরেজীতে লেখা হলেও এর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বাংলা অক্ষর।